সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে...

দিলরুবা শাহানা

গল্পটা সেজানের নয়, রিদ্‌ভারও নয়। চব্বিশ বছর পর সেজান দেশে ফিরেছে। রিদ্‌ভাকে নিয়েই সে এসেছে। তবুও গল্প তাদের নয়। এই দীর্ঘ সময় প্রবাসজীবনে আপনজনদের জন্য যেমন মন কেমন করতো সেজানের তেমনি মন কেমন করতো আরও কিছুর জন্য। সেই আরও কিছু হল তাদের গ্রামের বাড়ীর কাঠের ঘর, পিছনের আঙ্গিনার বিশাল শিরিষ গাছে ফুলের উচ্ছ্বাস, দাদীর কারুকাজ করা চন্দনকাঠের ছোট্ট সিন্দুক। তার পরিবার খুব স্বচ্ছল না হলেও তারা খুব যে অভাবী ছিল তাও নয়। মোটামুটি স্বাছন্দ্যের জীবনই ছিল। বিদেশ যাবার নেশা ধরেছিল তার। এম এ পাশ হলনা আর। পাড়ি জমাল প্রথমে ফিনল্যান্ডে। লেখাপড়া ও কাজ দুইই করেছে সমান তালে। টাকাপয়সাও দেশে পাঠাতে ভুলেনি। তবে মন কেমন করা অনুভূতিটা তার কখনোই হারিয়ে যায়নি। মা-বাবার জন্য মন খারাপতো হতোই এবং সেজান তাদের আনন্দিত করেছে ভালবাসা মাখানো কথা ও শিষ্টাচার দিয়ে। অর্থকরি দিয়ে তাদের আরাম-আয়েসে জীবন কাটানোর সব ব্যবস্থা করেছে। তাদের উৎফুল্ল কণ্ঠ সেজানের দেশত্যাগের মানসিক গ্লানি ও প্রবাস জীবনের শারিরীক ক্লান্তি-শ্রান্তি ভুলিয়ে দিতো। সবার গ্লানিবোধ হয় কিনা সে জানেনা। তবে দেশে ফিরে আসার তাগাদা তখন অনুভব করেনি তেমন। বিদেশী একটি পাসপোর্ট যেদিন পেল সেদিন অন্য অনেকের মত অহেতুক অহংকার তার হয়নি তবে মনে হয়েছিল সবুজ পাসপোর্টের দেশটা যেন অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এবার দেশে এসে মনটা বিষন্ন, ক্ষুব্ধও কিছুটা। মা-বাবা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকার কথাও নয় অবশ্য। তাদের ছাড়া বাকী সবকিছু ঝক্‌ঝকে, নতুন, সবাই ভাল, ভাইবোনেরা সুখী সমৃদ্ধ। গ্রামের বাড়ী দোতলা হয়েছে। পুরনো সব উধাও। এই শীতেও ইটের দালানকোঠায় ঠান্ডা তেমন লাগছেনা। কিন্ত সেজানের মন গ্রামের দারুন শীতে কাঠের ঘরের উষ্ণতার আমেজ পেতে চাইছিল যে। বসন্তে শিরিষ গাছে ফুলের সম্ভার উপচে পড়ার দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আর কোনদিন কারোও হবেনা । ওই শিরিষগাছের কাঠ দিয়ে এই সুন্দর নতুন পাকাবাড়ীর দরজা- জানালা তৈরী হয়েছে, কাঠের সুদৃশ্য পেচানো সিড়ি না না শুদ্ধ হবে বলা স্পাইরাল সিড়ি দোতলায় উঠে গেছে। ভাই বললো, ‘জান দাদাভাই কাঠের সব কাজ হয়েছে বাড়ীর শিরিষ আর মেহ্‌গনী গাছের কল্যাণে, কোন কাঠ কিনতে হয়নি’।

মনে পড়লো সিন্দুকের ঢাকনা তুলে তার ভিতরে চন্দনের সুবাস নেওয়ার কথা । বাইরে নয় সিন্দুকের ভিতরে চন্দনের গন্ধ ছিল গাঢ়।

‘দাদীর সিন্দুকটা কইরে?’

‘ওটা এত্তো পুরানো সখিনার মা বুয়াকে দেওয়া হয়েছে, আর এই নতুন বাড়ীতে ওটা মানায়ও না’

ভাইয়ের উন্নাসিক উচ্চারণ সেজানকে বড় ব্যথিত করলো।

দাদীর বাবা যশোরের আদালতের সেরেস্তাতে কাজ করতেন। সে অঞ্চলের এক হিন্দু জমিদারের জমিজমা সংক্রান্ত একটি মূল নথি বা দলিল সেরেস্তা থেকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিলেন ইনি। ওই দলিল জমিদারবাবুকে বিরাট ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছিল। কোন একসময়ে সে জমিদার তার কিছু জিনিসপত্র নিলামে বিক্রি করেছিলেন। ওই সব জিনিসের মাঝে চন্দনকাঠের সিন্দুকটিও ছিল। সেরেস্তাদার সস্তায় শত বছরের পুরনো চন্দনকাঠের সিন্দুকটি কিনেছিলেন। পরে নাকি জমিদার সেরেস্তাদারকে চিনতে পেরে সিন্দুকের দাম লোক মারফত ফেরত পাঠিয়েছিলেন। হয়তো দলিল খুঁজে দেওয়ার উপকারের জন্য উপহার। এসব গল্প সব দাদীর কাছে শুনেছে।

এতো বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। সেজান তার বউ রিদ্‌ভার কাছে গল্প করেছে এসব কিছুর। পুরনো স্মৃতিমাখা জিনিসপত্র এবং ঐতিহাসিক জায়গা দেখা খুবই পছন্দ রিদ্‌ভার। ওইসব জিনিস রিদ্‌ভাকে দেখাবে বলে কত সখ আর স্বপ্ন ছিল। রিদ্‌ভা ফিনল্যান্ডের মেয়ে। বরফে ঢাকা থাকে বছরের বেশীর সময় সে দেশ। রিদ্‌ভার মা-বাবা ছিলেন বৃদ্ধ। যাদের দেখভাল করে শীতের দেশে বিষন্ন দিন কাটতো রিদ্‌ভার। তারা মারা যাওয়ার পর পরিচয় হয় সেজানের সঙ্গে। একসময়ে নিকট বন্ধু, নিষ্ঠ সঙ্গী সেজানকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যায় রিদ্‌ভা। ওখানেই শর্ত দিয়ে সেজানকে বিয়ে করে রিদ্‌ভা। আমেরিকার মেরীল্যান্ডে থিতু হয় ওরা। শর্ত হল তারা কোনদিন পৃথিবীর জনসংখ্যায় শরীক হতে কাউকে আহ্বান করে আনবে না। বাবা-মায়ের বেশ বয়সকালে রিদ্‌ভার জন্ম। বয়ষ্ক অসুস্থ মা ও বাবাকে দেখাশুনা করতে করতে কৈশোর ও তারুণ্য চলে গেছে কখন টেরই পায়নি। নিজের সন্তানকে যাতে মা-বাবার সেবাযত্নে জীবনপাত করতে না হয় সেজন্যই এ সিদ্ধান্ত রিদ্‌ভার। সেজানও বুদ্ধিমতী, শক্তপোক্ত তবে অসাধারন সংবেদনশীল হৃদয়বতী মেয়ে রিদ্‌ভাকে জীবনসঙ্গী পাওয়ার আনন্দে সমর্থন করে ওই সিদ্ধান্ত। রিদ্‌ভাই সেজানকে দেশে আসতে উৎসাহিত করেছে। রিদ্‌ভার মায়াবতী মনের আকুতিই সেজানকে দেশের জন্য ব্যাকুল করে তুলে। এসে ভাইবোনের ঝলমলে জীবন দেখে আশ্বস্থ হয়েছে তবে বিস্মিত হল দেখে তাদের সবকিছু নতুন, সবকিছু আধুনিক। তারা সবাই চলতি হাওয়ায় ভেসে চলেছে। নিজের মনেই ভাবে সেও যেমন একদিন চলতি হাওয়ায় পাল তোলে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। তবু ভালবেসে পারিবারিক ঐতিহ্যের গল্প বলে এমন জিনিসপত্র আগলে রাখবে না এ কেমন কথা!

নিজের মনোভাব ব্যক্ত হলনা, সব প্রশ্ন অনুচ্চারিতই রইলো। রিদ্‌ভার সংবেদনশীল মন আঁচ করেছে সেজানের টানাপোড়েন, মনোকষ্ট। বললো
'যা কিছুর জন্য মন খারাপ করছো সেগুলোর দেখভাল্ আর যত্ন তুমিও করনি, কি আর করা; চল এ কয়দিনে দেশটাই ঘুরেফিরে দেখি'।
রিদভাকে কিছু বললোনা তবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল এই দেশে সে আর আসবে না। ঢাকায় রওয়ানা ডাক্তার ভাইয়ের গাড়ীতে। এই গাড়ী তাদের আসা উপলক্ষে নতুন কেনা হয়েছে। যে কয়দিন দেশে থাকবে তাদেরই খেদমতে সদা হাজির থাকবে গাড়ী। সেজান লক্ষ্য করলো ভাইবোন দু'জনেরই একের বেশী গাড়ী রয়েছে। ড্রাইভারও একজন নয় দু' দু'জন করে ড্রাইভার রয়েছে প্রত্যেকের। সে ভাবলো এইদেশ বলেই এমন বিলাসিতা সম্ভম।

শাহবাগের কাছে এসে কি কারনে যেন গাড়ী থামিয়ে নেমে গেল ড্রাইভার। বোধহয় পানির বোতলটোতল কিনতে। সেজান গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে বাইরে চোখ ফেললো। একটা দৃশ্য তার চোখ কেড়ে নিল। চিনতে পারার উত্তেজনায় সে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। কনফেক্‌শনারীর খাবারের প্যাকেট দু'হাতে আগলে এগিয়ে আসছে যে নারী তাকে সে চেনে, সঙ্গের ড্রাইভার গোছের লোকটিরও হাত উপচে পড়ছে খাবারের প্যাকেট।

'আরে রাইসা না!'

একটা মাইক্রোবাসের দিকে এগিয়ে যাওয়া রাইসা নামের মাঝবয়সী মাঝারি গড়নের মহিলা ঘুরে দাড়ালো। তার কণ্ঠেও বিস্ময়ের অনুরণন

'সেজান তুমি এখানে! ফিনল্যান্ড থেকে ফিরেছ কবে?'।

সেজান সংক্ষেপে তার জীবনের গল্প শেষ করেই স্ত্রী রিদ্‌ভাকে ডেকে একসময়ের সহপাঠিনী রাইসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

'তোমরা এখন যাচ্ছো কোথায়?'

'দেশ দেখতে রওয়ানা আরকি'

মহা উৎসাহে রাইসা গাড়ি দেখিয়ে বললো 'চল আমার সাথে আমি দেশ দেখাবো তোমাদের। পরে তোমাদেরকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাব কেমন।'

ভাইয়ের গাড়ির ড্রাইভারকে সব বুঝিয়ে দিয়ে রিদ্‌ভাকে নিয়ে সেজান রাইসার মাইক্রোবাসে গিয়ে উঠলো। গাড়িতে দেখে কনফেক্‌শনারীর খাবারের প্যাকেট শুধু নয় ছোট ছোট টবে অনেক ধরনের গাছের চারাও ভর্তি। রাইসা বললো

'এসব কেন পরে বলছি। আমরা এখন যাচ্ছি মির্জাপুর ও টাঙ্গাইল ছাড়িয়ে মধুপুরের কাছাকাছি এক গ্রামে। গত চারপাঁচ বছর ধরে আমি দেশে এসে মাসদেড়েক থাকি। তখন কাছাকাছি গ্রামের কিছু বাচ্চাদের নিয়ে গাছপালা লাগিয়ে পরিবেশ সুস্থসতেজ করার কাজ করি। আর...'
'তোমার স্বামী?'
'তুমিতো জান আমার স্বামী গবেষক-শিক্ষক একই সাথে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ। পন্ডিত মানুষ, ঢাকা শহরে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে পরিবেশ নিয়ে বক্তব্য রাখে আর কখনো সখনো বন্ধুবান্ধবের সাথে ঢাকা ক্লাবে আড্ডায় বসে, পানীয় ভাসে এই আরকি।'

একটু থেমে রাইসা বললো
'আমি পরিবেশকর্মি তাই আমার কাজ গ্রামে, বলতে পার গ্রাসরুটে। ছেলেরা বড় হয়েছে, উড়তে শিখেছে তাই পাখির মত বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে, তবে ভাল আছে ওরা। আমার সময় এখন নিজের মনপছন্দের কাজে খরচ করি।'
রাইসার কথা শুনে সেজান ভাবছিল গ্রামের মানুষই আসলে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে মিলেমিশে বাস করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সুস্থ সতেজ হলে গ্রামীণ মানুষ যারা তাদের জীবনযাপন সহজ হয়। স্যুটবুট পরে নদী বন বাঁচাও বললেও শহরের মানুষ কল ঘুড়িয়ে জল আর বোতাম টিপলে বাতি-বাতাস সবই পায়। খাল-নদী-বন তাদের খুব মনে হয় দরকারে লাগেনা। তাদের সেবায় বিজ্ঞান ও কারিগরী উন্নয়নের নির্যাসটুকু নিবেদিত। তবে সব শহুরেরা এই সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পান না এই সত্য সেজান জানে। ধ্যাত্‌ কি সব ভাবছে সে।
চিন্তা থমকে গেল রিদ্‌ভার প্রশ্ন শুনে
'তোমার রাশান নাম কেন? রাইসা রাশানদের নাম হয়।'
রাইসা অবাক ওর মুখে বাংলা শুনে। সেজান বল্লো
'অবাক হচ্ছো! ও ফিনল্যান্ডে বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্টদের মাঝে কাজ করতো, এখন আমেরিকাতেও তাই করছে।'
'আমার দাদীর নাম ছিল আয়শা তার সাথে ছন্দ মিলিয়ে আমার নাম রাখা হয় রাইসা। পরিবারের মুরুব্বীরা জানতোইনা যে এটা রাশান নাম'
'এটা তাইলে কালচারাল ব্যাপার!'
'মানে? কি বলতে চাইছো তুমি?'
'দাদাদাদীর নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা; যেমন সেজান আলির দাদার নাম ছিল আজান আলি'

‘শোন রিদ্‌ভা দু'জন মানুষের নামের ইতিহাস শুনেই তুমি এটাকে কালচারাল নর্ম ভেবে বসোনা। মনে কর শতকরা একান্ন জন মানুষের নামের পেছনে যদি একই ধরনের ইতিহাস থাকে তখন এই কথা বলা যায়’

‘ঠিক বলেছ’

‘তবে আমার বাংলাদেশের মানুষ চারপাশের জগৎ মানে পৃথিবীর সব বিষয়ে উৎসুক, আমেরিকানদের মত উদাসিন আর নির্লিপ্ত নয়। আমাদের সববিষয়ে জানাশোনা ও খবরাদি রাখার অভ্যাস, এর প্রভাব পড়ে নামেও। আমাদের মাঝে লেনিন, রুশো, রাসেল, সাদ্দাম, ইয়াসির নামগুলোই তার প্রমাণ’

‘তোমাদের মাঝে মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো বা হিটলার নাম কেউ রাখে কি?’

‘আল্লাহ্‌ মাফ করুক বাংলাদেশের মানুষের এমন কুরুচি যেন না হয়!’

ওর বলার ভঙ্গিতে রিদ্‌ভা হেসে উঠলো।

রাইসা আর রিদ্‌ভা যখন বাংলাদেশের মানুষের নামকরনের ধরনধারন ও পছন্দ নিয়ে সারগর্ভ বাক্য বিনিময় করছে সেজান তখন শহর ছাড়িয়ে গ্রামমুখী রাস্তার দু'পাশ অসম্ভব মনোযোগ ও মমতা নিয়ে দেখেই চলেছে। বিস্মিত হল ভেবে যে এখানে এতো অযত্নে বেড়ে উঠে সবুজ গাছগাছালী, লতাফুলপাতা। তবুও কত মনোহর, কত মায়াবী! সেজান আগে এতো ভালবাসা নিয়ে দেশের দিকে তাকায়নি কখনো। দেখলো গাড়ীচলা রাস্তার ঢালে টিনের ঘরের পিছনে কলা গাছের ছায়ায় লালসবুজ রঙের ডুরে শাড়ীপরা এক নারী। কোলেধরা শিশুটির মুঠিবদ্ধ হাত তুলে নিজ ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে। সেজান ঘাড় ঘুরিয়ে আরেকবার সেই সবুজ গাছের মায়া ও সন্তানের মুঠিতে চুমুখাওয়া নারীর চেহারায় অমরাবতীর আনন্দের যে ঝিলিক তা দেখে নিল। এতো অল্পতে এতো সুখ!

গ্রামে এসে গাড়ি থামলো। গাড়ীর চালক ছেলেটিও অসাধারন। এই গ্রামেরই বিশ্ববিদ্যালয় পাস এক যুবক। এই গ্রামের স্কুলেই পড়ায় আর গাছ লাগিয়ে বেড়ায়। সেজান অবাক হল যে রাইসার উৎসাহে এই যুবক গাড়ী চালানো শিখে এখন মহা উৎসাহে মাইক্রোবাস চালিয়ে নিজ কাজকর্ম করে।

আট/নয় থেকে পনেরো বছরের বিশ-ত্রিশটি ছেলেমেয়ে অপেক্ষা করছিল। রাইসা সবাইকে নাম ধরে ডাকছে তার মানে ও সবাইকে চেনে। সবাই টিউবওয়েলের পানিতে হাত ধুয়ে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে বসে মহা আনন্দে কনফেক্‌শনারীর কেকবিস্কুট দিয়ে নাস্তা সারলো। তারপর রাইসা খাতা খুলে একে একে নাম ধরে ঢেকে সবার ভালমন্দ খোঁজখবর নিল। তাদের লাগানো গাছেরা কেমন আছে জানলো। এরমাঝে দশএগারো বছর বয়সের একটি ছেলে চাটাইয়ের শেষ মাথায় মুখ বেজার করে বসেছিল। তার নাম ডাকতেই রাইসার সামনে গিয়ে বসেই দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। তার লাগানো গাছগুলোর মাঝে একটি মারা গেছে তাই তার কান্না। যাই

হোক রাইসা ওকে সুন্দর করে বোঝাল, ওর সঙ্গীদের উৎসাহিত করলো ওর পাশে দাড়াতে, সহযোগিতার হাত বাড়াতে।

আরও একটি ছেলে চুলে তেলটেল মেখে বেশ পরিপাটি। তার সঙ্গে কথা বলার সময়ে রাইসার চোখেমুখে খুশী ও বিস্ময় উপচে পড়ছিলো। এই ছেলেটি কালাম। বাবা বজ্রপাতে মারা যাওয়ার পর ছেলেটির কমবয়সী মাকে আবার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামার বাড়ীতে কালাম আশ্রিত। দু'বছর আগে তার চেহারা ছিল করুণ, কাপড়চোপড় জীর্নশীর্ন। এই গাছের মায়ায় জড়িয়ে সে মামার বাড়ীকেও ফলফুলের সম্ভারে সাজিয়ে তুলেছে। মামীর সুনজরে পড়েছে নিজের গুণের কারনে। এখন মামামামীর আদরযত্ন যে পায় তার প্রমাণ ছেলেটির তেলমাখা চুল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভুষা। রাইসা এমনভাবে কালামের কথা সবার সামনে তুলে ধরলো যে সবাই খুব উজ্জীবিত হল। তারপরে খুব উৎসাহ নিয়ে তাদের সারাদিনের কর্মকান্ডের সঙ্গী হল রিদ্‌ভা। রিদভার উৎসাহ দেখে সেজান কিছুটা বিরক্ত। কিছুটা বা বিস্মিত, মুগ্ধ। তুষারঝরা দেশের মেয়ে রিদ্‌ভা কি এদেশের প্রকৃতির উষ্ণতায় উদ্দীপ্ত নাকি অতি সাধারন মানুষের আন্তরিকতায় আপ্লুত বুঝতে পারছে না যে সেজান। আর রাইসাকে সেজানের মনে হচ্ছিল সে যেন একজন মটিভেশনাল স্পীকার নাকি উদ্দীপ্তকারী এক বক্তা।

গাড়িতে উঠতে যাবে ওরা তখন দেখে এক মহিলা এক হাতে মাথায় আঁচল তুলতে তুলতে আরেক হাতে বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে দ্রুত পায়ে আসছেন আর 'কালাম' কালাম' বলে ডাকছেন। ইনিই কালামের মামী। ঝুড়িতে বড়ই, টমেটো, বেগুন, লেবু। লাজুক গলায় বল্লেন

'কালামের লাগানো গাছের তাজা জিনিস'।

ওদের সবার হৃদয় যেন ওই গ্রামের এক ঝুড়ি ভালবাসা পেয়ে গেলো।

ফেরার পথে একে একে এদের কথা রাইসা সব বল্লো। কথাবার্তা রাইসা সব ইংরেজীতেই বলছিল যাতে সবাই বুঝতে পারে। রিদ্‌ভা মৃদু স্বরে বল্লো

'বাংলায় বল এতে আমার ভাষা ইমপ্রুভ করবে; না বুঝলে আমিই বলবো'। রিদ্‌ভার সবকিছুতে আগ্রহ সেজানকে আবারও মায়ায় জড়ালো তার দেশ। সে আসবে এইদেশে, বার বার আসবে। দেশ শুধু আত্মীয়স্বজন, বিষয়আসয় নয় তারও চেয়ে বেশী কিছু।

ধীরে ধীরে চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসলো। মির্জাপুর ছাড়ানোর পর পরই পুলিশ গাড়ি থামালো। রাইসা ভীত হল কিছুটা। রিদ্‌ভাকে নিয়ে পুলিশের প্রশ্ন

'বিদেশী মহিলা কি পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করেছেন?'

রাইসা বা সেজান কিছু বলার আগেই রিদ্‌ভা বলে উঠলো

'আমি পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ফরেনার রেজিষ্ট্রেশন আইনে কাজটি সেরে এসেছি'

রিদ্‌ভার বাংলা শুনে পুলিশ কথা বাড়ালোনা।

সেজান বল্লো

'এটা কখন কার সাথে গিয়ে করালে?'

‘তোমার ল'ইয়ার বোন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল’।
রাইসা আর সেজান দু'জনেই ফরেনার রেজিস্ট্রেশন বিষয়টা নিয়ে কথা বলে চললো। ঢাকায় পৌঁছে ওদের নামাতে নামাতে রাইসা জানতে চাইলো
‘তোমরা কি আগামী বছর আসবে?’
সেজানের বলার আগেই রিদ্‌ভা বলে উঠলো
‘অবশ্যই, আমরা আসবো ওই কাজে আমরাও সাথী হব’।